নারীর প্রতি সহিংসতা : মৃত্যুদন্ডের নতুন বিধান

শাহ আলম বাদশা

১৩ অক্টোবর "নারী ও শিশুনির্যাতন দমন আইন-২০০০" এ র সংশোধনী এনে বাংলাদেশে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদ ন্ডের বিধানসংক্রান্ত 'নারী ও শিশুনির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ , ২০২০' শীর্ষক নতুন অধ্যাদেশে সই করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের ফলে সংশোধিত আইনটি কার্যকর হয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় সংসদে "নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে (সংশোধন) বিল-২০২০ পাশ হয়েছে। এমনকি এ আইনের আওতায় ইতোমধ্যে টাঙ্গাইলের এক আদালত থেকে পাঁচ ধর্ষকের মৃত্যুদন্ডাদেশও দে ওয়া হয়েছে। ফলে দেশের আতঙ্কিত জনগণ এবং উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি নেমে এসেছে।

সম্প্রতি বিভিন্নস্থানে ধর্ষণের ঘটনা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় দেশের ভাবমূর্তি অনেকটা ক্ষু ণ্ন হয়েছে। এর মধ্যে গত ৪ অক্টোবর নোয়াখালীতে একজন নারীকে (৩৭) বিবস্ত্রকরণসহ নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর দেশজুড়ে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে। লাগাতার ধর্ষণ এবং যৌননিপীড়নের বিরুদ্ধে দেশজু ড়ে ধর্ষকদের মৃত্যুদন্ডের আইনপ্রণয়নের দাবির প্রেক্ষিতে আইনের সংশোধনীটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদ ন শেষে অধ্যাদেশ আকারে জারি হ য়। ২০০০ সালের 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন' আইনের 'ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু র শাস্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ৯(১) ধারা মতে, বাংলাদেশে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তবে ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে বা দল বেধে ধর্ষণের ঘটনা য় নারী বা শিশুর মৃত্যু হলে বা আহত হলে , সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড। উভ য়ক্ষেত্রে ন্যূনতম একলক্ষ টাকা করে অর্থদন্ডের বিধানও রয়েছে। সে আইনটিতেই পরিবর্তন এনে 'ধর্ষণ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবনের বিধান' যুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে অর্থদন্ডের বিধান তো থাকছেই। আর অধ্যাদেশে মামলার বিচার শেষ করতে ছয়মাস বা ১৮০ দিনের বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়েছে। ২০০০ সালে জারিকৃত 'নারী ও শিশুনির্যাতন দমন' আইনের ৩৪টি ধারার মধ্যে ১২টিতেই বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি হি সেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান ছিল। পরবর্তীতে অ্যাসিড নি য়ন্ত্রণ ও মানবপাচার সংক্রান্ত দুটি আইনের অংশ পৃথক হওয়ায় এ আইনের সাতটি ধারা য় মৃত্যুদন্ডের বিষ য়টি বহাল থাকে। 'নারী ও শিশুনির্যাতন দমন আইন , ২০০০' এর ৯(১) ধারায় বলা হয়েছে , 'যদি কোনো পুরুষ কোনো নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন , তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন। ' নতুন অধ্যাদেশে এই ৯(১) ধারাটি সংশোধন করে একই অপরাধে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবনের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী ৯(১) উপধারায় 'যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হা সিনা বলেছেন, ধর্ষকদের পাশবিকতা থেকে নারীদের রক্ষা করতেই মৃত্যুদন্ডের বিধান। আইনমন্ত্রী বলেছেন, ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদন্ড করায় এ অপরাধ কমে আসবে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন , ধর্ষণের দায়ে সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত হলে অপরাধীদের মধ্যে ভীতি তৈরি হবে। সহিংসতা ও ধর্ষণ বন্ধ করতে হলে এ ধরনের কঠোর আইন প্রয়োগের প্রয়োজন। মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন , ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নও এগিয়ে গেল। উল্লেখ্য , ইরান, সৌদি আরব, মিশর, ইরাক, বাহরাইন ও উত্তর কোরি য়ার মতো বেশকিছু দেশে ধর্ষণের অপরাধে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যা , তথ্যউপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় , দেশে ধর্ষণের সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু পুলিশের পরিসংখ্যানানুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৯ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৫ ,৪০০টি। তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশে ধর্ষণের হার ৩.৮০ অর্থাৎ প্রতিলাখ নারী-শিশুর মধ্যে প্রায় ৪ জন নারী-শিশুকেই ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে , যা স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। ১৯৯১ , ২০০১, ২০১১ ও ২০১৮ সালে প্রতিলাখে ধর্ষণের হার যথাক্রমে ০.৩৯ , ২.৩৭, ২.৩৮ ও ২.৪৫ জন। পরিসংখ্যানমতে, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ধর্ষণের হার বাড়ার পরিমাণ প্রতিলাখে ১.৩৫ জন বা এক-তৃতীয়াংশ (বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ওয়েবসাইট, ২০১৯)। তবে নারী-শিশুর প্রতি সার্বিক সহিংসতা বা নির্যাতনের প্রকাশিত ঘটনার মাত্রা আরও অনেকবেশি। ২০১৭ ও ২০১৮ সালেও যথাক্রমে প্রতিলাখে এ হার ছিল ৮.১৮ ও ৭.২১ জন। এমনকি ২০১৯ সালের প্রথম ৬ মাসে নারী ও শিশুনির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১০ হাজার ১৫৯টি এবং এ হার আগের প্রায় দ্বিগুণ।

অন্যদিকে, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর তথ্যমতে , ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ধর্ষণের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে মোট নারী ও শিশু ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৭৩২টি , সেখানে ২০১৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪১৩টি (আসক, ২০২০)। এসব মিডিয়া ও তথ্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত ঘটনা এর চেয়েও অনেকবেশি হতে পারে। ডয়েচে ভেলের তথ্যানুযায়ী, বিদেশি সমীক্ষা মোতাবেক বাংলাদেশে ধর্ষণের হার প্রতিলাখে ১০ জন এবং সমগ্র বিশ্বে আমাদের অবস্থান ৪০তম। ধর্ষণক্ষেত্রে আমাদের থেকে অধঃপতিত দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা , লেসোথো, বোতসোয়ানা, সোয়াজিল্যান্ড ও সুইডেনে ধর্ষণের হারও যথাক্রমে প্রতিলাখে ১৩২ , ৯৩, ৮৩, ৭৮ ও ৬৩ জন (ডয়েচে ভেলে , ৬ অক্টোবর ২০১৯)। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে প্রতিলাখে ৮ জন নারীধর্ষণের শিকার হয় , যা বাংলাদেশের তুলনায় কম। এ থেকেই আমাদের নারীশিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণের প্রবণতা আন্দাজ করা যায়। ধর্ষণের ফলে বিচারপ্রার্থী নারী ও শিশু এবং তাদের পরিবারের দিন কাটে প্রচন্ড যন্ত্রণায়। এই পাশবিক বর্ব রতার স্মৃতি তারা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। নষ্ট হয় তাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবন।

বাংলাদেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ ধর্ষণ , নারী ও শিশুনির্যাতনের ঘটনা ঘটে , সে তুলনায় বিচারের হার অত্যন্ত কম। এদেশের মেট্রোপলিটন এলাকায় ট্রাইব্যুনালে নারী ও শিশুধর্ষণের যে বিচার হয় , সেখানে মাত্র ২.৬ শতাংশ মামলায় চূড়ান্ত রায় হয়। অথচ ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের নথিবদ্ধ অপরাধীর মধ্যে ৩৩.৪ শতাংশ অপরাধীকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রায়ানের তথ্যমোতাবেক, প্রতিহাজার ধর্ষণের মধ্যে ৩৮৪টি পুলিশের কাছে নথিবদ্ধ হয় , ৫৭টিতে গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে , ১১টি বিচারিক প্রক্রিয়ায় যায়, ৭টি তে ১ বছরের বেশি শাস্তি দেয়া হয় এবং ৬টিতে কারাগারে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৯০ দিনের মধ্যে তদন্তশেষে চূড়ান্ত চার্জ দেয়ার বিধান থাকলেও পুলিশের কর্মভার মামলার চার্জশিট সঠিক সময়ে দে ওয়া সম্ভব হয় না। চার্জশিটের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দুর্বলতার কারণেও ভুক্তভোগী নারী ও শিশু ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।

সম্প্রতি সংশোধনের আগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলাটি নিষ্পত্তির নির্ধারিত ১৮০ দিন সময় বেঁধে দেওয়া থাকলেও শেষ না হলে কী হবে তার উল্লেখ না থাকায় এই সুযোগ নেন আইনজীবীরা। ফলে দফায় দফায় মামলার তারিখ পড়ে ও পিছিয়ে যায়। আগে আদালতে কেউ সাক্ষ্য দিতে এলে সরকারিভাবে তাদের যাতায়াতসহ নির্দিষ্ট পরিমাণ খরচ দেওয়া হতো কিন্তু, এখন সেই টাকা প্রদান করা বন্ধ হয়ে গেছে। যাতায়াত খরচ দেওয়ার কারণে সাক্ষীরা আদালতে সাক্ষ্য দিতে উৎসাহিত হতো। এখন খরচ নিজেদের দিতে হয় এজন্য সাক্ষী নিজেও আসতে চায় না।

সুতরাং নতুন অধ্যাদেশ অনুযায়ী ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে এবং দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ধর্ষণসহ সব অপরাধমূলক কর্মকান্ডরোধে জনগণের সামাজিক অঙ্গীকারসহ অংশগ্রহণও অত্যন্ত জরুরি। এজন্য সমাজের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে ব্যাপক গণসচেতনতাসৃষ্টির করতে হবে। অধ্যাদেশজারির পর ইতোমধ্যে একটি আদালত থেকে ধর্ষকদের ফাঁসির দন্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে , যা জাতির মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছে। আমরা এখানে সেই রায়ের তথ্য তুলে ধরছি---

“নারী ও শিশুনির্যাতন দমন আইন-২০০০ ” এর সংশোধনের পর সর্বপ্রথম (১৫ অক্টোবর) ধর্ষণমামলায় পাঁচজনের মৃত্যুদন্ড দেন টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক খালেদা ইয়াসমিন। সরকার আইন সংশোধন করে ধর্ষণের সাজা মৃত্যুদন্ড ঘোষণার পরপরই অপহরণের পর সংঘবদ্ধ ধর্ষণমামলায় এ রায় দেয়া হয় , যদিও রায়টি হয়েছে পুরনো আইনেই। প্রত্যেক আসামিকে আদালত একলাখ টাকা করে জরিমানাও করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয়ের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর সংশোধনের ফলে দেশে ধর্ষণের মতো অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমবে বলে আশা করা যায়।

#

২৭.১২.২০২০ পিআইডি ফিচার